বাঙলায় নারীর ভাষা

শ্রীসুকুমার সেন

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি সব সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট সামাজিক ব্যবধান আছে। অবশ্য এই ব্যবধান সর্বত্র সমান নয়। পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র আর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আলাদা বলেই এই পার্থক্যের উদ্ভব। আর এই জন্যে সকল দেশেই নারী ও পুরুষের ভাষায় কমবেশি পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কোথাও কম, আর কোথাও বেশি। সভ্য জগতে, যেখানে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র প্রায় এক হয়ে এসেছে বা আসছে, সেখানে এই পার্থক্য খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু অসভ্য সমাজে—যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে—এই পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট (Jespersen, Language, ২৭৩ পৃ.)।

পুরুষ ও নারীর ভাষার প্রভেদ মূলতঃ এই বিষয়গুলিতে।

ক. নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল। অর্থাৎ পুরুষ যত শীঘ্র পুরানো কথা ত্যাগ করতে বা নতুন কথা গ্রহণ করতে পারে, নারী তত শীঘ্র পারে না। এই জন্যে নারীর ভাষাতে আমরা এমন অনেক পুরানো শব্দ পাই, যা অন্যত্র লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই রক্ষণশীলতার কারণ অবশ্য এই যে নারীকে তার ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকতে হয়, 'সুতরাং ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা-ভাষী লোকের সংস্পর্শে তার আসবার সুযোগ হয় না। বিখ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরো (Cicero) এক স্থানে বলে গিয়েছেন যে, যখন তিনি তাঁর শাশুড়ির কথা শোনেন, তখন তাঁর মনে হয়, যেন তিনি প্রাচীন লাটিন কবি 'প্লাউতুস' (Plautus) বা 'নায়ভিউস্' (Nævius)-এর কথা শুনছেন।

খ. নারীর ভাষার জোর প্রকাশক (intensive ও emphatic) শব্দ ও অব্যায়ের খুব বেশি প্রাচুর্য দেখা যায়। বাক্যে স্বরাঘাত (accent) ও সুরের তারতম্যও (intonation) আর একটি প্রাচীন লক্ষণ।

গ. জুগুপ্সা ও অমঙ্গল-বাচক শব্দগুলির পরিবর্তে অন্য শব্দ প্রয়োগ করা নারীর ভাষার একটি প্রধানতম লক্ষণ। নারী স্বভাবতই লজ্জাশীলা ও কোমলহৃদয়া বলে কতকগুলি শব্দ ও বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তাকে হয় অন্য

শব্দ ব্যবহার করতে হয়, অথবা সেই বিষয়কে ঘুরিয়ে প্রকাশ করতে হয়। এই দিক দিয়েই ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে নারীর সবচেয়ে বেশি সাহায্যের পরিচয় আমরা পাই।

ঘ. সব জাতির মধ্যে না পাওয়া গেলেও প্রায় দেখতে পাওয়া যায় যে, নারীর পক্ষে কতকগুলি শব্দ (আর নাম) উচ্চারণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। অনেক দেশেই এই নিয়ম আছে যে, স্ত্রী তার স্বামী বা স্বামীর গুরুজনের নাম নিতে পারে না। ভারতবর্ষের আধুনিক আর্যভাষা-ভাষীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। বৈদিক যুগে এইরূপ কোন নিষেধ ছিল বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব এর মূলে অনার্য 'কোল' প্রভাব নিহিত আছে। এটাও সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মেয়েরা কিছুতেই অপদেবতার নাম বা অমঙ্গলসূচক বিষয় বা বস্তুর নাম উচ্চারণ বা উল্লেখ করে না বা করতে চায় না। এটার কারণ অবশ্য অন্য [আগে (গ) দেখুন] । অথর্ববেদে একটি মন্ত্র আছে (৮,৬)। এই মন্ত্রতে গর্ভিণী নারীকে কোন এক অপদেবতার দৃষ্টি হতে রক্ষা করবার জন্যে এক বিশেষ ওষধির সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই মন্ত্রের মধ্যে সেই অপদেবতার একবারও নাম করা হয়নি, কেবল কতকগুলি বিশেষণের সাহায্যে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

ঙ. নারীর শব্দভাণ্ডার পুরুষের শব্দভাণ্ডার থেকে খুবই আলাদা। নারী পুরুষের তুলনায় অনেক কম শব্দ ব্যবহার করে। গতানুগতিক জিনিসকে এড়িয়ে চলাই পুরুষের স্বভাব। সে নতুন নতুন শব্দ ও বাক্যের দ্বারা ভাব প্রকাশ করতে চায়—পুরাতনের মোহ তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। নারীর ব্যাপার এর ঠিক উল্টো। এই জন্যেই কি জগতে আজ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির স্ত্রী-কবির উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয়নি?

আজ পর্যন্ত নারীর ভাষা নিয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা হয়নি। আমি এখন শুধু বাঙলায় নারীর ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলব। বিস্তৃত আলোচনা এখানে এখন সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে আমার বিস্তৃততর প্রবন্ধ **Women's Dialect in Indo-Aryan**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হবে। এই বড়ো প্রবন্ধটিতে আমি বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বাঙলা পর্যন্ত নারীর ভাষার একটা ধারাবাহিক আলোচনার চেষ্টা করেছি। আমি এ বিষয়ে যা কিছু আলোচনার চেষ্টা করেছি, তা কেবল

'যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত।'

সেই পূজনীয় শিক্ষক অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় ও সাহায্যে। তাঁকে এইখানে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই প্রবন্ধে 'বাঙলা' বলতে কেবল পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ হুগলি-বর্ধমান-চব্বিশ পরগনার মুখের ভাষা বুঝোবে। পূর্ববঙ্গের মেয়েদের ভাষার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এখনকার পুরুষের ভাষায় এমন অনেক শব্দ ও বাক্য ঢুকে গিয়েছে, যা নারীর ভাষার এককালে বিশেষ সম্পত্তি ছিল। যেমন, 'ফোড়ন দেওয়া' বাক্যটি (অর্ত, অর্বাচীন বয়সের লোকের বিজ্ঞজনের মত মন্তব্য প্রকাশ

করা) পুরুষেরা ব্যবহার করলেও এটি মুখ্যত মেয়েদের ভাষার কথা। আজকাল কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই বলে, 'অমুক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল' অর্থাৎ খুব রেগে গেল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, এই বাক্যটি মেয়েদের কাছ থেকে এসেছে; এর উৎপত্তি রান্নাঘরের বেগুন ভাজার কড়ার মধ্যে থেকে।

বাঙলার মেয়েদের ভাষা একটু অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় যে, ওঁদের ভাষার সংযম বলে জিনিসের বালাই মোটেই নেই। নিজেরা লজ্জাশীলা হলেও আর নিজেদের 'অবোলা' বললেন ও ওঁদের জিহ্বায় কিছুই আটকায় না। আধুনিক শিক্ষার ফলে এ জিনিসটি অবশ্য কমেছে। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মেয়েলি ভাষা আজকাল অচল। অলঙ্কারের অত ভক্ত হলেও বাক্যালঙ্কার কেবল পরের প্রতি শ্লেষোক্তিতে পর্যবসিত।

এক

আগেই বলা হয়েছে, নারীর ভাষায় শব্দের অনেক প্রাচীন রূপ রয়ে গিয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, ভদ্রঘরের মেয়েরা 'ল'-এর জায়গায় 'ন' খুব বেশি ব্যবহার করে। তারা 'লুচি', 'লঙ্কা', 'লেপ', 'লাউ' না বলে 'নুচি', 'নঙ্কা', 'নেপ', 'নাউ' বলে। এতে অনেকেই উপহাস করে বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, আমাদের বাঙলা ভাষার ইতিহাসে এমন এক সময় এসেছিল, যখন সমস্ত 'ল' (এমনকি, যে সমস্ত 'ল' প্রাচীনতর 'র' থেকে এসেছিল, তারাও) 'ন' হয়ে গিয়েছিল'। যেমন রথ্যা <'লচ্ছা' <নাছ, (নাছদুয়ার = সদর দরজা)। ভদ্র শ্রেণির পুরুষেরা 'ন' বলা এখন গ্রাম্য মনে করেন আর চেষ্টা করে 'ন' উচ্চারণ বর্জন করেন।

দুই

নারীর ভাষায় কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়ের আর উপসর্গের (prefix-এর) প্রাচুর্য দেখা যায়। সেগুলি এই,—

ক. —অন্ত [< প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় (প্রা. ভা. আ. তে) কর্তৃবাচ্যের অসমাপিকা প্রত্যয় অন্‌ত্]। এগুলি মেয়েদের ভাষায় বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়। যেমন, অসাজন্ত বর, বাড়ন্ত গড়ন (বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার হয়), বিয়ন্ত গাই, উঠন্ত বয়স, হাসন্ত মুখ, ভাসন্ত চোখ।

খ. —অন্তী [< প্রা. ভা. আ—অন্‌ত্ + ইক + আ]। স্ত্রীলিঙ্গ (বিশেষ্য বা) বিশেষণ। যেমন, কাজুন্তী (= কর্মঠ), দেখুন্তী, নিখাউন্তী (বা নিখান্তী), অবিয়ন্তী (যেমন, অবিয়ন্তীর ঠুন্‌কো ব্যথা), নাচুন্তী।

গ. —অন [<প্রা. ভা. আ-অন]। এই ক্রিয়া-বিশেষ্য (verbal noun) বাচক প্রাচীন প্রত্যয়টি পূর্ববঙ্গের ভাষায় এখনও জীবিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে কেবল মেয়েদের মধ্যেই এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রচলন সীমাবদ্ধ। যেমন, জ্বলন, পোড়ন, নাচন, চলন, বলন, ঝোঁটন, দেখন, ফোড়ন, বেঁধন, কাঁদন।

ঘ. —কী[১]। যেমন, বড়্কী (= বড়ো বৌ; এই শব্দগুলি প্রায়ই সম্বোধনে ব্যবহার হয়), মেজ্কী (< মেঝ্কী = মেঝ বৌ), সেজ্কী, ছুট্কী (< ছোট্কী)।

ঙ. —পনা [< প্রা. ভা. —আ, ত্বন[২] নিন্দার্থক (pejorative)],—গিন্নিপনা (গিন্নেপনা), ন্যাকাপনা, আহ্লাদেপনা, বেহায়াপনা, সতীপনা, আদিখ্যেতাপনা, দস্যিপনা, দাসীপনা, অসভ্যতাপনা, চেঙড়াপনা, দুরন্তপনা, ('বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি'—রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি। পুরুষের ভাষায় এই রকম স্থলে গিরি প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

চ. —পানা [< পারা + পনা[৩]] । বিশেষণ প্রত্যয়। যেমন,—চাঁদপানা, চুনপানা, কুলোপানা, হাঁড়ীপানা।

ছ. —টি, —টী। ছোট ছেলের বয়স বলবার সময় এই প্রত্যয়টির ব্যবহার করা হয় ষষ্ঠী-প্রত্যয়ান্ত পদের সঙ্গে। যেমন,—অমুক যখন সাতমাসের-টি বা দেড় বছরের-টী ইত্যাদি।

জ. —ইন [প্রা. ভা. আ, —নী (স্ত্রীপ্রত্যয়ে)[১]]। যেমন,—ঠাকরুন (= শাশুড়ি), নাতিন, মিতিন (= সই), সতীন।

ঝ. —ইষ্টি (—ইষ্টি) [প্রা. ভা. আ.-ইষ্ঠ থেকে অর্ধ-তৎসম] [—নিন্দার্থক (pejorative)]। যেমন,—ধম্মিষ্টি, দানিষ্টি, কম্মিষ্টি।

ঞ. আ—[প্রা. ভা. আ.-অ]। যেমন—আদেখলা (বা হাদেখ্লা), আবাগী (আভাগী <অভাগ্যিকা), আভাতারী, আসেদ্ধ, আরাঁধা ইত্যাদি।

ট. হা- [এই শব্দগুলি সবই সমাস-বদ্ধ, কতকগুলি 'হা' এই দুঃখবাচক অব্যয়ের সঙ্গে যোগ ক'রে হয়েছে, আর কতকগুলি সংস্কৃত হত, হতক> প্রাকৃত হদ, হদঅ > হঅ, হঅঅ এই পদের সঙ্গে সমাস ক'রে হয়েছে। তুলনীয় হঅগ্গাম (= পোড়া গাঁ), হতখণ, (< হতস্তন), হঅলজ্জা (= পোড়ালজ্জা), অআরাঈ (—হত-রাত্রি)। যেমন,—হাঘরে, হাপুতী, হাভাতে (হাবাতে), হাপিত্যেশ।

তিন

কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাঙলাদেশে ছেলেমেয়েদের নামকরণে মেয়েদেরই সম্পূর্ণ হাত ছিল। এখনও এমন অনেক নাম পাড়াগাঁয়ে কম-বেশি প্রচলিত আছে, যা মেয়েদের ভাষা থেকে এসেছে। এগুলি এখন ফ্যাসান-দুরস্ত বলে গণ্য নয়। যেমন,—শৈল [<সহিল <সহ্]। পর পর তিনটি ছেলের পর মেয়ে হলে কিংবা পর পর তিনটি মেয়ের পর ছেলে হলে এই নাম রাখা হ'ত। মনে হয়, শব্দটির ঠিক বানান দন্ত্য 'স' দিয়ে, কিন্তু তৎসম নাম 'শৈলবালা', 'শৈলেন্দ্র' প্রভৃতির প্রভাবে তালব্য 'শ' এসে গিয়েছে।

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে ছেলের আদর আর মেয়ের অনাদর। বেদে পাই—কৃপণং দুহিতা জ্যোতি র্হ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্, আর আধুনিক বাঙলায় মেয়েলী চড়ায় পাই—পুতের মুতে কড়ি। এই ছড়া দুইটির ভাষা আলাদা হলেও ভাবটা

একই। এই জন্যেই মেয়ের মা অনেকগুলি কন্যা প্রসব বন্ধ করবার জন্যে শেষ মেয়ের নাম থাকমণি বা আন্নাকালী (=আর না কালী)। মনে করবেন না যে, এই নাম রাখা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। যে মেয়ের ডাক নাম শুনবেন আনি বা আনু তাকেই বুঝে নেবেন যে, কিছুতেই সে তার মায়ের একমাত্র মেয়ে নয়।

মৃতবৎসার সন্তানের নাম প্রায় কড়ি দিয়ে রাখা হয়; যেমন,—এককড়ি, দোকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছ্কড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি। ভাবটা এই যে, যমের কাছ থেকে অতগুলি কড়ি দিয়ে কেনা হ'ল। সেইরকম—কেনারাম, বেচারাম, রাখহরি (= হে হরি বাঁচিয়ে রাখ), ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীবর, কুড়ো, কুড়োরাম, কুড়ুনী (কুড়িয়ে পাওয়া, সেই জন্যে যমের দৃষ্টি পড়বে না) ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যকালে নিমাই নাম দেন অদ্বৈত-আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী। নিমের মত তেতো ব'লে ডাইনীরা ছোঁবে না। যথা,—ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই [শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত]। 'নিমাই' শব্দ 'মাতৃহীন' অর্থেও হতে পারে; যেমন,—যার নৌকা (না) নেই, সে 'নিনাই'; এখানে ছেলেটির মা নেই, হে যম দয়া করে নিও না। তুলনীয় কালিদাসের 'উমা' নামের ব্যাখ্যা—উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদ্ উনাখ্যং সুমুখী জগাম (কুমারসম্ভব)।

চার

এইখানে কতগুলি শব্দ (বিশেষ্য ও বিশেষণ) দিচ্ছি, যা নারীর ভাষার একরকম নিজস্ব বলা চলে।

অবিয়ত [(=অবিবাহিত); <অ + বিয় (বিবাহ) + ত]। অনাছিষ্টি (অর্ধতৎসম < অনাসৃষ্টি)। অলবড়ড = লক্ষ্মীছাড়া < ?] [আক্‌খুটে?]। আঁটকুড়ো, কুড়ী (রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এ আঁটকুড়ীর সংস্কৃত রূপ 'অষ্টকুষ্ঠী' দিয়েছেন) [আঁট + কোষ্ঠ (= গর্ভ)]। আড়ি যেমন—আড়ি, পাতা। আদিখ্যেতা (= আধিখ্যতা)। আটকাল (= আন্দাজ)।

আব্দা (= অন্যায় আবদার)। আহিঙ্খে [< অভি + কাঙ্ক্ষ (?)]। এয়ো (<অবিধবা), এওৎ (< অবিধবত্ব)। কুঁদুল (কোঁদল। কল্লা (= ন্যাকামি)। কানড়া (কানোড়া; = অনুগত)। কুলুকখেত্তর (= তুমুল ঝগড়া, <কুরুক্ষেত্র)। কুট্‌নী (প্রাকৃত কুট্টনী), কোট্‌না। খোয়ার। খোঁটা (= গঞ্জনা)। গ্যাদা, গিদে, গুমোর। গা (= অঙ্গচেষ্টা, ইচ্ছা অর্থে)।

চিক্কুরী, চিক্‌রুণী (= ন্যাকামী)। ছিরি (<শ্রী)। ছেনাল (<প্রাকৃত ছিন্নাল, —লী)। ছেনালী। ছাঁদ (<ছন্দ)। জল্‌জলা (= সহবৎ)। টঁস। টাঁইস (তাঁইস)। ঠমক। ঠোকনা। ঠোনা। ঠ্যাকার (= গর্ব)। ডোক্‌রা, ড্যাক্‌রা। ঢঙ, ঢপ। তুস্কু (ফলনা তুস্কু)। দেমাক। দেয়ালা (<দেবকাল?) ধাঁচা। ধুমসী, ধুমড়ী। ন্যাকা। ন্যাটা (= ঝঞ্ঝাট)। ন্যাওটো, —টা (<স্নেহবৃত্ত)। নেকরা, নেকরামি। নোঙ্‌রা। নোলা (<লোল)। নোটোমি। পোষানী (= ধাইকে ছেলে পুষতে দেওয়া)। পেট (= গর্ভ)। বউড়ী (<বধূটিকা)। বরাখুরে, বাঙ্‌খুরে

[<বক্র, বঙ্ক?] । বাওচাল্লি। বিয়েন। বিট্‌লে, বিটেল। বেহায়া। ব্যাগত্তা (<ব্যগ্রতা), ভাগ্যিমানী। ভাজা (= গর্ভিণীর উৎব-বিশেষ)। ভিরকুটি, —কুট্টি। মচ্ছিভঙ্গ। মদ্দানি। মিন্‌সে। যাদু (<যাত)। রাঁড়, রাঁড়ী (= বিধবা)। শাশুড়ে। সন্দ (<সন্দেহ)। সাউখুড়ি, —খড়ি (<সাধুকরিক)। সেয়ানা (= প্রাপ্তবয়স্ক)। সোমত্ত। সোয়ামী। সোহাগ (<সৌভাগ্য)। সাধ (<শ্রদ্ধা = গর্ভিণীর উৎসব বিশেষ)। হুড়কো [মেয়ে]। হেনস্থা। কাপ (= ন্যাকামী)। কু (= মন্দ; যেমন কু বাঁটা। সু (= ভাল; যেমন সু ছেলে)। খাঁই (= দাবী)। ঢেমন, ঢেমশ, ঢেমনী। ধাধস। ধিঙ্গি। পয়মন্ত। বিদ্যানী (= বিদুষী, নিন্দার্থে)। ব্যাখ্যানা। সই। সয়া। ইত্যাদি।

পাঁচ

নারীর ভাষায় বিশেষণগুলি বেশ ঝাঁঝাল। সব বিশেষণগুলিই একটু অনাবশ্যক জোর আর ঝাঁঝের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

পোড়া (নিন্দার্থক)। যেমন,—পোড়া দেশে কি লোক নেই? কি পোড়া নিয়ম হ'য়েছে! পোড়া পেটের জ্বালায় আর মান থাকে না। 'পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই' (চণ্ডীদাস)। পোড়া অদেষ্ট। পোড়া চোখে কি কিছু দেখি? ইত্যাদি। এই প্রয়োগ আমরা প্রাকৃতেও পাই; যেমন,—দড্‌ঢকায় (= পোড়া শরীর)[১], দড্‌ঢহিঅঅ[২], দড্‌ঢ-লোঅ (= পোড়া লোক)[৩] ইত্যাদি।

রাজ্য, রাজ্যি (অর্থহীন নিন্দার্থক বিশেষণ)। যেমন,—রাজ্যের লোক (= অনেক লোক)। যত রাজ্যের অনাছিষ্টি কাণ্ড।

ছয়

বিবাহিত নারীর বৈবাহিক সম্বন্ধসূচক অনেকগুলি বিশেষ শব্দ আছে। যেমন—ক. ঠাকুর-ঝি, দেওর-ঝি, ভাসুর-ঝি, বোন-ঝি [পুরুষের পক্ষে কিন্তু ভাগ্‌নী] । খ. ঠাকুর-পো, (দেওরের সম্বোধন), দেওর-পো, ভাসুর-পো, বোন-পো [পুরুষের পক্ষে ভাগ্‌নে] । গ. দেওর, ভাসুর, ঠাকুর (= শ্বশুর), ঠাকরুন (= শাশুড়ির সম্বোধন), ননদ, নন্দাই (<ননান্দ্‌-পতি), যা। ঘ. মাসাস (মাস-শাশুড়ি), পিসাস (=পিস-শাশুড়ি), বট্‌-ঠাকুর (ভাসুরের সম্বোধন), ঠাকুর-জামাই (= নন্দাই)।

সাত

বাঙলায় নারীর ভাষায় সমাসের বাহুল্য একটা প্রধান বিশেষত্ব। নিম্নশ্রেণির স্ত্রীলোকদের কটূক্তি বর্ষণ শুনলে এর প্রতীতি হয়। সব রকম সমাসই দেখা যায়। যেমন,

ক. বহুব্রীহি : (১) অবৈধ (incestuous) সম্বন্ধসূচক—বাপ-ভাতারী, বোন-মেগো ইত্যাদি। (২০) শারীরিক বিকৃতিসূচক—উট-কপালী, ছার-কপালী, পোড়া-কপালী, চিরুণ-দাঁতী, গোমড়া-মুখো (-মুখী), পোড়ার-মুখো (-মুখী), মুখ-পোড়া (-পুড়ী)।

(৩) বিবিধ—কোল-সোহাগী, শতেক-খোয়ারী, নি-সেধো, অপ্‌পেয়ে, হাঘরে, পাটা-বুকী ('মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর'), বার-দুয়ারী, পর-ঘরী, পর-ভাতী, নোলা-দেগো, নিঘিন্নে।

খ. তৎপুরুষ : থলে-ঝাড়া, হাড়-হাবাতে, বেড়ী-পেটা, ভয়-তরাসে, ঘুম-কাতুরে, জন্মায়তি, সর্ব-রক্ষে, মুখ-নাড়া, হুড়-বিত্তি, মুখ-ঝাম্‌টা, মেয়ে-মদ্দানি, মেয়ে-নেকড়া, হাত-তোলা, বৌ-কাঁট্‌কী, একেশ্বরী, ইষ্টি-কুটুম, কাঁচা-পোয়াতী, আপ্ত-গরজে, একল-বেঁড়ে, হতচ্ছেদ্দা, নানা-কূটী, তিতি-বেরক্ত, দন্যে-দশা, আপ্ত-সুখী, শতেক-নোংরা, পিত্তি-রক্তে ইত্যাদি।

গ. উপপদ : পাড়া-বেড়ানী, পাড়া-ঢলানী, পাড়া-জাগানী, পাড়া-মজানী, ভাল-খাকী, ছিচকাঁদুনী, ভাতার-কামড়া, হাড়-জ্বালানে, দুধ-তোলানী, ঢেউ-নাচানী, সর্ব-নাশী, দেইজি-ঘাটা, নেই-আঁকুড়ে (= ন্যায়-আঁকড়িয়া), ঘর-জ্বালানী, পর-ভোলানী, কোল-পোঁছা, ঝাঁটা-খেকো, -খাকী ইত্যাদি।

ঘ. অসমাপিকা সমাস : [তুলনীয় বৈদিক 'ভরদ্‌বাজ', 'বিদদ্‌বসু', 'জমদ্‌অগ্নি'] দেখন-হাসি, উড়ন-চণ্ডী ইত্যাদি।

ঙ. দ্বন্দ্ব : ঝি-জামাই, ভাতার পুত, নাতি-নাতকুড়, ভাই-ভায়াদ, লজ্জা-সরম, বাড়-বাড়ন্ত, ঘর-ঘর, চাল-চুলো, রান্না-বান্না, যত্ন-আত্তি, সোনা-দানা, রাঙ-রত্তি, খুদ-কুড়ো, গয়না-গাঁটী, গল্প-গাছা, হুস-পবন, থিত-ভিত, ছিরি-ছাঁদ, ছানা-পোনা, আপ্ত-বন্ধু, মন্দ-ছন্দ, জাত-জন্ম, রঙ্গ-ভঙ্গ, অকথা-কুকথা, বাছ-বিচার, সাত-সতেরো, নয়-ছয়, গত্তি-গরাস ইত্যাদি।

চ. আম্রেড়িত পদ : [এদের ঠিক আম্রেড়িত বলা চলে না; এই সমস্ত পদগুলিতে একটি শব্দ ও তার সমার্থক বা অর্থহীন সমধ্বনি শব্দ সমাসের মতোই বিন্যস্ত থাকে।] ঢলা-ঢলি, হিম-সিম, গিনি-বান্নি, ডামা-ডোল, নট-ঘটী, নেটি-পেটী, হেঁজি-পেঁজি, হাবজা-গোবজা, এলো-পেলো, ফস্‌টি-নস্‌টি, গাড়ুর গুপসো, নাদুস-নুদুস, চ্যাবা-চোবা, পাঁচ-পাঁচি ইত্যাদি।

আট

বিশেষ্য বাক্যাংশ [Nominal Phrase] : আঠাশে খুকী, আদরে গোবরে, অন্ধর নড়ি, উমদো রাঁড়ী, এক গলা ঘোমটা, একরত্তি ছেলে, এক গঙ্গা জল, কচি খুকি, কড়ার কুটো, কড়ে রাঁড়ী, অমুকের কল্যাণে, কাঁচা বয়েস, কোলের ছেলে, খড়ম পা, খাবার কুটুম, খুদে নদনদ, গুণের ছেলে, ঘুমে কাদা, চোখের আড়, চোখের বালি ('সহজে চক্ষের বালি হৈয়াছি সবার'—পদকল্পতরু), ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, কুমড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর, দাঁতে বিষ, দুধের ছেলে, দুধের বাছা, ধুন্ধুমার ঝগড়া, ধোয়া নৈবিদ্যি, ননীর পুতুল, নাড়ীর টান, নানাকুটি কথা, নেও ভাতার, পাকা ঝিকুর, পেটের ছেলে, বাপের ভাগ্যি, বালশ পোয়াতী,

ভর সন্ধ্যা, মড়ুক্ষে পোয়াতী, মনের কালি, মাথার দিব্যি, অমুকের বরাতে, মাওড়া ছেলে, বুড়ো চোস্‌কা, ভাতাত্তির মাগ, রাই ধনী, রাঙা বৌ, রামের রাধা, বাঁড়ী বালতী, রূপের ডালি, শিবরাত্রির সলতে, যেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, সতা-সতীনের ঘর, সাতপুরুষের নাউখোলা, সাতাশে ছেলে, সোনার ছেলে, সোনার চাঁদ, সোনার বাছা, সোনার লতা, সোনার সীতা, সোহাগের আরসী, হাড়াই ডোমাই, হাড়ীর হাল, হাঁকরা ছুড়ী, হাঁড়ীর খবর, সাত ছরকোট, সাত চোরের মার, বাঁঝা খাটুনী, ঝাঁঝা তক্ক, যমের অরুচি, যমের ভুল, রূপের ধুচুনি ['সাত' এই সংখ্যাটি মেয়েদের ভাষায় খুব বেশি পাওয়া যায়। যেমন সাত চড়ে রা বেরোয় না। সাত পাঁচ ভাবা। সাতে পাঁচে না থাকা। সাতভাতারী সাবিত্রী। সাত সরষে দিয়ে নাওয়া। ইত্যাদি।]

নয়

ক্রিয়া বাক্যাংশ [Verbal Phrase] : একে তো বাঙলা ভাষায় যুক্ত ক্রিয়ার (compound verb) সংখ্যা খুব বেশি, নারীর ভাষায় তো কথাই নেই। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেইজন্যে আমি খুব সাধারণ গোটাকতক প্রয়োগ ধরে দিচ্ছি :

বানের জলে ভেসে আসা, ধনে ধানে ঘর উথলে ওঠা, নইনত্র করা, গুণ করা, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করা, ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, চিপ্‌টেন কাটা, থোতা মুখ ভোঁতা করা, দেখ মার করা, প্রাণ টা টা করা, মুখ করা, পাঁশ পেড়ে কাটা, মাথা কাটা, অমুকের মাথা খাওয়া, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, ব্যথা খাওয়া, হাঁড়ী খাওয়া, পিণ্ডি চটকানো, হাড় মাস কালি করা, হাড় জুড়োনো, হাড়ে নাড়ে জ্বালানো, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া, চোখ টাটানো, নিজের কোলে ঝোল টানা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা, হাঁড়ী ঠেলা, গা তোলা, কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো, জাত-জন্ম না থাকা, হাট হয়ে থাকা, দু পায়ে থেঁতলানো, দিষ্টি দেওয়া, মুখে ওলোক দেওয়া, শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া, হাতে টুক্‌নী দেওয়া, মুখ নাড়া দেওয়া, গতরে পোকা ধরা, কড়ার কুটোটি না নাড়া, মাটিতে পা না পড়া, পুঁয়ে পাওয়া, পাকা চুলে সিঁদুর পরা, আড়ি পাতা, সই পাতানো, মন পাওয়া, কপাল ফেরা, বিয়ের ফুল ফোটা, ঠেস দিয়ে কথা বলা, কেঁদে হাট বসানো, গাছ-কোমর বাঁধা, ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা, হেসে না বাঁচা, কু বাঁটা, হেসে মরা, ঘাট মানা, পেটের ভাত জল হয়ে যাওয়া, পেটের মধ্যে হাত পা সেঁধিয়ে যাওয়া, খেটে খেটে হাড়ে মাসে বেটে যাওয়া, বুকে ভাত রাঁধা, হাড়ে বাতাস লাগা, ধর্মে না সহা, মুখ-নাড়া সহা, সাধা পাড়া, গরে আমড়া পোকা ধরা, ঘুমিয়ে কাদা(বা ন্যাতা) হওয়া, দু'হাত এক হওয়া, পেট হওয়া, ঝক্কি পোয়ান, মাছের তেলে মাছ ভাজা, হাঁড়ীতে স্থান দেওয়া, মুখে খই ফোটা। ইত্যাদি।

দশ

ক. ভাবদ্যোতক শব্দ ও অব্যয় : সমবয়স্কাদের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপে কথার আগে 'হাঁলো', আর কথার শেষে 'লো', 'লা' ব্যবহার হয়। এখন এই শব্দগুলি কেবল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ

সখী বা আত্মীয়াগণের মধ্যেই ব্যবহার হয়। সমবয়স্কাদের ভদ্র আলাপে এখন 'ভাই' শব্দের প্রচলন খুব দ্রুতবেগে হচ্ছে (এটি অবশ্য পুরুষের ভাষা থেকে এসেছে)। পূর্বে এই স্থলে 'বোন' (বা বুন') এই শব্দের প্রচলন ছিল, এবং পল্লীগ্রামে এখনও আছে। অধিক বয়স্কাকে সম্বোধন করলে 'দিদি' বলা হয়। স্কুলের মেয়েরা তাদের শিক্ষয়িত্রীকে সম্বোধন বা উল্লেখ করতে হলে অমুক 'দিদি' বা অমুক 'দি' বলে। 'মা', 'ওমা' বা 'ধন্যি' হচ্ছে বিস্ময়াসূচক আর 'আহা' অল্প বিস্ময় জড়িত লজ্জার দ্যোতক। কোন অমঙ্গলসূচক কথা শুনলে মা বা মাতৃস্থানীয়রা 'ষাট্' বলেন, অর্থাৎ মা ষষ্ঠী যেন যেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাসের অমঙ্গল দূর করেন। সন্তান হাঁচলে 'জীব' শব্দ বলা হয়। এই 'জীব' শব্দ বলার প্রথাটি খুবই প্রাচীন এবং এ কেবল মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষে আসবার অনেক আগে থেকেও আর্যদের মধ্যে এই প্রথা ছিল বলে বোধ হয়। করণ, যুগোশ্লাভরা হাঁচলে এখনও zhivote অর্থাৎ 'জীবত' বলে। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথা সার্বজনীন ছিল বলে বোধ হয় [গর্গজাতক দেখুন] 'বালাই' (ফার্‌সী শব্দ) অমঙ্গল নিষেধক অব্যয়।

খ. ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ বা বাক্য : অবাক করলে! আমরি! ও হরি! কি গেরো! ও আমার পোড়া কপাল! কি ঘেন্না! কি লজ্জা! কি হবে! মাগো ['ম্যা গো' ঘৃণার্থক]! হা...যো! আমরণ! কথার ছিরি দেখ! পোড়ার দশা আর কি! মরণ আর কি! মরি কি রূপ! [এই প্রয়োগ কাব্যেও চলে গিয়েছে—'মরি কার পরশমণি গগনে ফলায় সোনা' (সত্যেন্দ্রনাথ)] ; যাবো কোথা! লক্ষ্মী ধন আমার! আমার মাথা খাও! সোত দোহাই তোমার! ইত্যাদি।

এগারো

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মেয়েরা অমঙ্গলবাচক বা অমঙ্গলসূচক শব্দ বা কথার পরিবর্তে অন্য কোন কথা ব্যবহার করে, কিংবা বিষয়টি ঘুরিয়ে প্রকাশ করে। এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিচ্ছি :

ভিখিরিকে ফিরিয়ে দিতে হ'লে বলা হল 'চাল বাড়ন্ত', বা 'হাত জোড়া'—'নেই' বললে অমঙ্গল বোঝাতে পারে। 'ভাত বাড়ার' বাড়া এই ধাতুর প্রয়োগও এই রকমে হয়েছে। পালিতেও এই প্রয়োগ রয়েছে—উণহভত্তং বড়্ঢেত্বা [উচ্ছিষ্টভক্ত জাতক] । সধবা নারী হাতের বালা চুড়ি ইত্যাদি খুলতে হলে 'শিথলানো' [অর্থাৎ শিথিল করা] বলে, 'খোলা' বললে বৈধব্য বোঝাতে পারে। পল্লীগ্রামের মেয়েরা এখনও রাত্রিবেলায় 'সাপ' 'বাঘ' ইত্যাদি না বলে বলে থাকে 'লতা' 'পোকা'। তেমনি অনেক জায়গায় মেয়েরা রাত্রিতে বাদুড়ের নাম করে না, বলে 'রাতচরা'। নাম শুনতে পেলে নাকি বাদুড়ের মুখে যা খায় তাই তেতো লাগে; জীবে দয়া প্রসূত এই প্রয়োগ।

বারো

বাঙলা দেশের মেয়েরা কথায় কথায় 'ছড়া' বা প্রবাদ-বাক্য ব'লে থাকে। অনেক ছড়াই কবিতার চরণ বলে মনে হয়। এর কারণ এই যে, মেয়েদের ভাষা ছন্দবহুল। এ বিষয়ে

আলোচনা করতে হলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। একটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি। এই ছড়াগুলি যে সবই খুব অর্বাচীন, তা নয়। কতকগুলির ভাব প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। যেমন,—

'জামাই এর জন্যে মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।' এর সঙ্গে তুলনা করুন : 'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সুপাদেরতিথ্যুপরাকত্বম্' [লৌকিক ন্যায়াঞ্জলি : ২য় খণ্ড]।

মেয়েদের ছড়ার মধ্যে দিয়ে আমরা বাঙলার মেয়েদের মনস্তত্ত্বের এমন একটা আভাস পাই, যা অন্যত্র সুদুর্লভ। বাঙলার মেয়েদের সঙ্কীর্ণতা—যেমন, প্রতিবেশীনীর উপর হিংসা আর বিদ্রূপ, বাপের ঘর থেকে সদ্যোবিচ্ছিন্ন নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহহীনতা, সতীনের প্রতি হিংস্রভাব, ঘরজামাই-এর উপর অশ্রদ্ধা, নববিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্ক দৃষ্টি—এইসব এই ছড়াগুলির মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয়। বাঙলার মেয়েদের যে স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা ছেলে-ভুলানো ছড়ায় পাই (রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রবন্ধ দেখুন), সেই মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা এগুলির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। যদি বা কোথাও তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তো সে ফল্গুনদীর মত একেবারেই অন্তঃসলীলা।

অনেকগুলি ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের টুকরো থাকা খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। আর অনেকগুলির মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়নি; যেমন,—

উলোর মেয়ের কুলুজী, অগ্রদ্বীপর খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।।

এইখানে কতকগুলি ছড়া উদাহরণের মত তুলে দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

অবাক করলে নাকের নথে।
কাজ কি আমার কানবালাতে।।

অসইরণ সইতে নারি।
থালার জলে ডুবে মরি।।

আজকের মাগ তুমি, রেঁধো না রেঁধো না।
চাল চিবিয়ে খাব আমি, ভেবো না ভেবো না।।

আমার নাম যমুনাদাসী।
পরের খেতে ভালোবাসি।।

আর সওদা যেমন তেমন খোঁপা-বাঁধা দড়ি।।

উদ্ খেতে খুদ নেই নেউলে বাজায় শিঙে।।
একে বউ নাচনী তার খেমটার বাজনী।।

কনের মা বাখ্নায়, আমার মেয়েটি ভাল।
ধান সিজানো হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কাল।।

কিবা ছেলের মুখের হাঁই।
তবু হলুদ মাখেন নাই।।

ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে।
পাড়াপড়্শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।।

তেলের ভাঁড়ে তেল নেইকো পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউকাঁট্কী ছিদাম তেলির মা।।

তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাব, আমরা উল্টো রথে যাব।।

নিতে পারি খেতে পারি, দিতে পারি না।
বলতে পারি কইতে পারি, সইতে পারি না।।

বউ ভাঙ্লে সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নী ভঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।।

ভাত পায় না চিঁড়ের নাগর।
আমানি খেয়ে পেট্টা ডাগর।।

যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুখোতে দিনু।।

যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।
যার মাথায় পাকা চুল তারই নাম বুড়ি।।

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (১৩৩৩) হইতে পুনর্মুদ্রিত]

তথ্যসূত্র

১. অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development of the Bengali Language* বইয়ের পৃ. ৫৩৫-৫৩৬
২. তবেদ, পৃ. ৬৮২
৩. তবেদ, পৃ. ৬৫৬
৪. তবেদ, পৃ. ৬৯৬
৫. তবেদ, পৃ. ৬৯৪
৬. তবেদ, পৃ. ২৪২
৭. তবেদ, পৃ. ৪১৯, ৭০৪, ৭১০
৮. গাহাসপ্তসঈ, পৃ. ২, ৩৪
৯. তবেদ, পৃ. ২, ৪১
১০. তবেদ, পৃ. ৬, ১

ঋণস্বীকার : জয়ন্তী উৎসব : স্মারক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা থেকে পুনর্মুদ্রিত।